বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকট এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যার কয়েকটি দিক

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং দেশে জাতীয় স্তরে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব শোধনবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা সফল পরিণতিতে যেতে পারল না। সংগ্রামে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে শোধনবাদকে শ্রমিক ও গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। একমাত্র এই পথেই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের বিজয় অর্জন সম্ভব।

কমরেডস ও বন্ধুগণ,

ইউ টি ইউ সি-এল এস*-এর আজকের প্রতিনিধি অধিবেশনে আমি খুবই সংক্ষেপে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আমার বিশ্লেষণ রাখার চেষ্টা করব। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে উদ্ভুত দুনিয়াজোড়া বিপ্লবী পরিস্থিতির সামনে প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ক্রমশ গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল — দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা। সেই সময় পৃথিবীর দেশে দেশে বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নানা দেশে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ ও জুলুম বর্তমান ছিল — সেইসব দেশগুলিতে মুক্তির সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে

* পরবর্তীকালে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে এ আই ইউ টি ইউ সি করা হয়।

উঠেছিল। কিন্তু কয়েক বছর বাদেই স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বহু দেশে জাতীয় স্তরেও শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গেল শোধনবাদীদের হাতে। ফলে বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হল এবং আমরা অনেকটা পিছিয়ে গেলাম। তারপর ২০-২২ বছর বা তারও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। দেখা গেল, আমরা বিপ্লবীরা যেমন ভেবেছিলাম, ঘটনা সেইদিকে মোড় নিল না। কিন্তু কেন এমন ঘটল? এর মূল কারণ কি সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি? আমি মনে করি, বিষয়টিকে এভাবে দেখলে ভুল হবে এবং পরিস্থিতির যথার্থ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে আমরা ব্যর্থ হব।

একথা ঠিক, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে প্রতিআক্রমণ করছে, বিপ্লবকে খতম করার জন্য সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মতে, বিপ্লবী আন্দোলনের বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ — সঠিক নেতৃত্বের অভাব, নেতৃত্বের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিপ্লবী চরিত্রের বেশ কিছুটা অধঃপতন।* এর ফলে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন পিছিয়ে গেল, মার খেয়ে গেল। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি (confusion) দেখা দিল, নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ল এবং পরিণতিতে বিপ্লবী আন্দোলনে ধীরে ধীরে ভাঙন শুরু হল। অথচ সময়টা কেমন ছিল দেখুন। পুঁজিবাদ একেবারে দুর্বল, তাকে আমরা কোণঠাসা করে ফেলেছি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমান্তরাল ও তার থেকেও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্ববাজারের পাশাপাশি তার থেকে সমৃদ্ধ ও সংকটমুক্ত এমন এক সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববাজারের জন্ম হয়েছে — যা কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিকাশের জন্যই নয়, যে সমস্ত পিছিয়ে-পড়া অনুন্নত দেশগুলির বিকাশে সাম্রাজ্যবাদ পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছিল, প্রয়োজনে তাদের সমস্ত রকমের আর্থিক সাহায্য করতেও সক্ষম। এরকম একটা অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কী ঘটে গেল দেখুন!

এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একে কেন্দ্র করে নতুন এক বিভ্রান্তির জন্ম হল। যেমন একদল বলতে শুরু করল, সাম্রাজ্যবাদ এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তার নতুন করে আর যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা এইরকম কথা বলে সব জিনিসটাকে গোলমাল করে দিয়েছিল, তারাই পরে বলতে শুরু করল, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নতুন করে

* তখনকার প্রেক্ষাপট। আজ তার রূপ আরও ভয়াবহ।

বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার শক্তি এমন এবং তাদের আণবিক দন্ত (nuclear teeth) এতই ধারালো যে, যে কোনও দিন পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর সারা পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায়, পরমাণু যুদ্ধের জন্য সমগ্র মানবজাতিই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি কবর ও ছাই-এর উপর সমাজতন্ত্র গড়ে তুলব? এ জন্য বিশ্বকে পরমাণু যুদ্ধ থেকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। যুক্তিটা শুনতে ভালই। এসব কথা শুনে সাধারণ মানুষ, এমনকী প্রগতিশীলদের একটা অংশও খুব বিপদে পড়ে যান। তাঁরা ভাবতে শুরু করেন, সত্যিই তো, যদি এইরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, মানবজাতির অবলুপ্তি ঘটে — তাহলে কীসের উপর সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে? দেখুন কী নিদারুণ পরিস্থিতি! যাঁদের উপর বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, যাঁদের অপরের বিভ্রান্তি দূর করার কথা — তাঁরাই পরস্পরবিরোধী কথা বলে নতুন নতুন বিভ্রান্তির জন্ম দিলেন। যেমন, প্রথমে বলা হল — সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, আমরা সংসদীয় পথে (parliamentary way) শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব (peaceful revolution) করতে পারি। কিন্তু যখন চারদিক থেকে 'এটা কী ধরনের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কী ধরনের বিপ্লব' বলে সমালোচনা উঠতে শুরু করল তখন সামান্য হেরফের করে বলা হল, বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে 'জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে' রূপান্তরিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিশাসনের হাতিয়ার পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত করা যেতে পারে এবং এইভাবে পার্লামেন্টের মাধ্যমেও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিপ্লব করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যে সময়ে সাম্রাজ্যবাদ একটা বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে বিরাজ করছে, যে সময়ে সাম্রাজ্যবাদীরা পরমাণু অস্ত্র (nuclear weapons) স্তূপীকৃত করছে, সেইসময় এভাবে বলার দ্বারা তো লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এ তো 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা' (inevitability of war in the era of imperialism and proletarian revolution) সংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিনের যে বিখ্যাত থিসিস (thesis) তাকেই অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন করারই এক ধূর্ত প্রয়াস। কিন্তু চারদিক থেকে যখন প্রশ্ন উঠতে থাকল, চাপ আসতে লাগল, তখন এঁরা কৌশল পাল্টাতে শুরু করলেন। কথার ধরন ঘুরিয়ে পরমাণুশক্তির বিভীষিকা ও পরমাণু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করলেন। আপনারা জানেন, এইরকম প্রোপাগান্ডা (প্রচার)

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরাও করছে। এ কথা ঠিক, শ্রমিক শ্রেণিসচেতন না থাকলে এই পারমাণবিক প্রতিযোগিতার (nuclear race) ফল ভয়ানক হবে। কিন্তু শোধনবাদী এই নেতাদের মধ্যে কাজ করছে একটি ভিন্ন মতলব। এদের কাছে এই কথাগুলি হচ্ছে, মূল প্রশ্ন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অজুহাত মাত্র। এরা এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করছে, যেন এখনই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যদি সব শেষ হয়ে যায়, যদি কিছুই টিকে না থাকে তাহলে সমাজবাদই বা কী, সাম্রাজ্যবাদই বা কী, আদর্শ (ideology) দিয়েই বা কি হবে? এরকম প্রচার আমেরিকা করেছে, আবার সোভিয়েত রাশিয়াও করেছে। আপনারা জানেন, জনমত বিভ্রান্ত করার জন্য এটা হচ্ছে আমেরিকার একটি কৌশল। কিন্তু কী দুঃখের কথা দেখুন, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশও আজ একই রকম প্রোপাগাণ্ডা (প্রচার) চালাচ্ছে। আমি এটা বলতে চাই না যে, রাশিয়া এটা জেনেবুঝে করছে, কিংবা আমেরিকার সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে করছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরা সবাই মূল প্রশ্ন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এটা সত্য যে, পরমাণু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, তার থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। তাই তাকে প্রতিরোধ করা বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করার এটাই কি বাস্তবসম্মত পথ? এখানে আমি পরমাণু যুদ্ধ রোখবার একটা সদিচ্ছাই শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি। আর দেখছি, মনগড়া ও ভিত্তিহীন এক ভীতির মানসিকতা এবং অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফিরিস্তি। এইভাবে তো এই সমস্যা থেকে যাবে, আর ভীতির আবহাওয়াও বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন আসবে, এইসব বিভ্রান্তিকর চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে কীভাবে? আমি মনে করি, বিপ্লবী চেতনাই এইসব চিন্তার মুখোশ খুলে দিতে পারে এবং এই বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েই একমাত্র একে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিপ্লবী চেতনা এতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্ক যতদূর সম্ভব ছিন্ন করে তাদের পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য করতে পারি। শুধু যুদ্ধ চাই না বললেই হবে না। যুদ্ধ প্রতিরোধ করার বাস্তবানুগ পদ্ধতি আমাদের যতদূর সম্ভব গ্রহণ করতে হবে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও শান্তি আন্দোলনকে এমনভাবে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গড়ে তুলতে হবে যাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায় এবং তার মূলোৎপাটন করা যায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য আলাপ-আলোচনা (negotiation), কূটনৈতিক সম্পর্ক (diplomatic relation) ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব (contradiction) প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই

যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। একইভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যারা এই মুহূর্তে যুদ্ধ চাইছে না, তাদের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করতে হবে। এইভাবে দুই দিক থেকে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের কোণঠাসা করে পিছু হঠতে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু এই কাজের পরিবর্তে আমরা যদি সাম্রাজ্যবাদীদের উপর ভরসা করে বসে থাকি, আইন তৈরি করে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় — এ রকম বিশ্বাস করি, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে সব কিছুর নির্ণায়ক বলে মনে করি, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাকেই একমাত্র রাস্তা বলে মনে করি — তাহলে এই সমস্যাকে আদৌ সঠিক পথে মোকাবিলা করা যাবে না। শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই আমাদের ধোঁকা দেবে — এটা আপনারা লিখে রাখুন। বর্তমান স্তরে বিপ্লবী চেতনার অর্থ হল, বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন তীব্রতর করা এবং এইভাবে জনসাধারণকে সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য অক্ষুন্ন রাখা। অন্যদিকে, যতক্ষণ না বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, ততক্ষণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তাদের সামরিক ও আত্মরক্ষার শক্তিকে অধিকতর মজবুত করা এবং তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আর এর সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে বাধ্য করা যাচ্ছে, ততক্ষণ নিজেদের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও সবরকমের অনগ্রসরতাকে দূর করাই হবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাজ। বাস্তবসম্মত এই পদক্ষেপগুলিকে একত্রে সংযোজিত করে এগোতে হবে। যুদ্ধের ভয়ে অহেতুক ভীত হলে চলবে না। শান্তি স্থাপনের জন্য অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু 'শান্তি' 'শান্তি' বলে চিৎকার করলেই কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন, কী করে আমরা শান্তি বজায় রাখতে পারি এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন কী করে আটকানো যায়, সবরকম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের কীভাবে বাধ্য করা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা হচ্ছে, এই সমস্ত প্রশ্নে সাম্যবাদী শিবিরে প্রবল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। এই সমস্ত বিষয়ের সাথে নেতৃত্বের প্রশ্নটি সরাসরি যুক্ত। তাই নেতৃত্বের প্রশ্নটি নিয়ে লেনিনকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। কারণ, দুনিয়ায় সর্বহারা শ্রেণি কোরবানি দিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় ও ইউরোপে খেটে-খাওয়া

অসংখ্য শ্রমিক আত্মাহুতি দিয়েছেন। কখনও কখনও মানুষের জীবনে কিছু সময়ের জন্য প্রতিক্রিয়ার পর্ব (phase of reaction) চলে, কিন্তু তা কেটেও যায়। সুযোগ এলেই মানুষ আবার লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুনিয়ায় লড়াকু মানুষের কখনো অভাব হয়নি। আজও সারা বিশ্বের খেটে-খাওয়া মানুষ লড়াইয়ের জন্য তৈরি এবং তাঁরা লড়ছেনও। কিন্তু খুবই উদ্বেগজনক কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ যখন আক্রমণ করছে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামগুলিকে পদদলিত করছে, তখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া হাত গুটিয়ে বসে তা দেখছে। এই আন্দোলনগুলিকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য করেই সে তার দায়িত্ব শেষ করছে। যখন কর্তব্য ছিল এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা, তখন 'আমরা তো সাহায্য করছি' — এই আত্মতুষ্টিতে তাঁরা ভুগছেন। এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির জন্মই হত না যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে বলিষ্ঠতার সাথে কার্যকর করা হত, যদি যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের রাশকে প্রতিহত করার চেষ্টা হত। এমনকী যদি একাজ শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও করা যেত, আমরা আপত্তি করতাম না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত দেশ শান্তি চায় তাদের সাহায্য নিয়ে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে দেওয়াই ছিল জরুরি কর্তব্য।

আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, বিপ্লবকে রক্ষা করা। কিন্তু 'যুদ্ধ বাধলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে', এই ভয়ে কি আমরা বিপ্লবের পথ থেকে সরে আসব? বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় যদি সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে বিপ্লবকে রক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি কি শুধুমাত্র তত্ত্ব বা আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে জিততে পারে? ভিয়েতনামের সর্বহারা জনসাধারণ কি কম লড়াই করেছে? লাঠি দিয়ে তারা লড়তে শুরু করেছিল, এখন তারা ভয়ঙ্কর মার্কিন মিলিটারি শাসনের নাপাম বোমা ও জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এখনও তারা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। ভিয়েতনামের জনসাধারণ কি কেবল আদর্শবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জিততে পারবে? এরকম অনেক প্রশ্ন নিয়েই আমাদের বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, একটি অত্যন্ত দুঃসহ, দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নেতৃত্ব প্রতারণা করেছে, আমরা মার খেয়েছি, আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। কিন্তু এসব নিয়ে দুঃখ করতে থাকলেই তো পথ পাওয়া যাবে না। আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর এভাবে প্রতারিত না হই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে

বিপ্লবের অনুকূলে এক বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল, একথা আমি আগেই বলেছি। যদি বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব সংশোধনবাদের শিকার না হতেন, যদি সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ফাটল না ধরত — তাহলে এই পৃথিবীকে আজ আপনারা ভিন্ন চেহারায় দেখতে পেতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তো আরও ২০-২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সঠিক পথে চললে বিশ্বপুঁজিবাদ এতদিন পর্যন্ত এত ঠাটবাট নিয়ে টিকে থাকার সুযোগ পেত না। আমি মনে করি, এর পুরো দায়িত্ব বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের। এই নেতৃত্ব অর্থাৎ বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব সঠিক মার্কসবাদী লাইনের পরিবর্তে সংশোধনবাদী লাইনের পথে চলেছে। এই আন্দোলনের মধ্যে এক বেদনাদায়ক দুর্বলতার জন্ম হয়েছে। একই সঙ্গে আমি এই কথাটাও বলব যে, এর দায়িত্ব আমরাও এড়িয়ে যেতে পারি না। যতটা বিপ্লবী দায়িত্ব আমাদের পালন করা দরকার ছিল, তা আমরা পারিনি। সাংগঠনিক দিক থেকে ততটা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে না পারার ফলে এই সমস্ত আদর্শগত বিভ্রান্তিগুলি উৎপাটিত করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা আমরা পালন করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা কাকে দায়ী করব? দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি, দেশের বেশ কিছু মানুষ যেমন ক্রমশ আমাদের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে একমত হচ্ছেন, আবার এটাও ঘটনা যে কিছু কিছু প্রশ্ন আবার তাঁরা এড়িয়েও যাচ্ছেন, যেন দেখতে পাচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে এইসব দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি জন্ম হওয়ার মূল কারণ কী? এর একটা কারণ, আত্মসন্তুষ্টি (complacency)। সংগঠন যখন বড় হতে থাকে তখন পেছনে চলার লোক, যাদের আমরা অনুগামী বলি, তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আবার লক্ষ লক্ষ লোক যখন পিছনে চলতে থাকে, দলের প্রভাব যখন দ্রুত বাড়তে থাকে, এটাও লক্ষ করা যায় যে, যখন এইভাবে দলের শক্তি বৃদ্ধি হয় তখন কখনও কখনও স্থবিরত্ব (stagnancy) এসে গ্রাস করে, সংগ্রাম করতে করতে একটা সময় প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মানসিকতাও কমতে থাকে। রাজনীতি ও পরিবর্তনের প্রতি এক ধরনের অনীহা (apathetic tendency to politics and change) মানুষকে গ্রাস করতে শুরু করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগত নিজেদের আদর্শগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক মান উন্নত করতে না পারলে, আত্মসন্তুষ্টি ও দম্ভ বৃদ্ধি পেলে এই সব সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে শক্তি ও প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ও সতর্ক না থাকলে এইসব প্রবৃত্তির জন্ম হতে পারে। এইসব দুর্বলতা যদি দূর করা না যায়, এইসব প্রবৃত্তি ও মানসিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য যদি লাগাতার সচেতন সংগ্রাম পরিচালনা করা

না হয় — তাহলে নেতৃত্ব শোধনবাদী বিচ্যুতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে একসময় যে নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা স্বচ্ছ ছিল, চিন্তায় গতি ছিল, বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে তথ্যের মধ্যে নিহিত সত্যকে পরিষ্কার দেখার ক্ষমতা ছিল — সেই নেতৃত্বের চিন্তাপদ্ধতি এবং বিশ্লেষণে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়।

আপনারা দেখছেন, এখন হচ্ছে স্লোগানবাজির যুগ। এমন বেশ কিছু নেতা আছেন যাঁরা ভাবেন, গভীর তত্ত্বকথা বা তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনা শুধু বিশেষ কিছু লোকের জন্যই। তাঁদের ভাব হচ্ছে, মেহনতি মানুষ এসবের কী বুঝবে? তাঁরা মনে করেন, মার্কসের বিচার-বিশ্লেষণ শুধু তাঁদের মতো 'বাবু'দের জন্য। শ্রমিকদের শুধু 'বিপ্লব চাই', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'লাল ঝান্ডার জয়', 'শোষকদের উৎখাত করতে হবে' এইসব স্লোগান দিতে জানলেই হবে, ব্যস্। দেখুন, এরই সর্বনাশা পরিণামে বিপ্লবের মূল তত্ত্বকে আয়ত্ত করার সংগ্রাম শুধু নেতাদের মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে এবং শ্রমিকরা এখনও অজ্ঞানতার সাগরে হাত-পা ছুঁড়ছেন। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা হল, আদর্শগত চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার ফলে, সেই নেতৃত্বও অধঃপতিত হয়েছে। যাঁদের চরিত্র একসময় বহু গুণে সমৃদ্ধ ছিল, দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তাধারা বৈপ্লবিক ছিল, যাঁরা একসময় শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন সংস্কৃতি, দৃষ্টিকোণ এবং বিপ্লবের চিন্তা-মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, জেনেবুঝে যদি তাঁরা এইভাবে চিন্তা নাও করে থাকেন, তাহলেও এই অশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যম্ভাবী পরিণামে তাঁদের পতন ঘটেছে। আপনাদের সামনে এঁরা বিরাট বিরাট নেতা হয়ে বিরাজ করলেও ভেতরে ভেতরে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, এঁদের চিন্তাধারা, এঁদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে।

সংস্কৃতি এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে (culture and ethics) সারা দুনিয়াতে আমি আজ এক ভয়াবহ অধঃপতন লক্ষ করছি। চিন্তার দৈন্য ও সীমাহীন আদর্শগত বিভ্রান্তি তো আছেই। কিন্তু সব থেকে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতন। গভীর দুঃখের বিষয় যে, শ্রমিক শ্রেণির নেতারাও এই সমস্ত ব্যাপারে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলেছেন। বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ নেতারাও আজ অন্যদের মতো মনে করতে শুরু করেছেন যে, জীবন শুধু আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য। এইভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন নেতৃত্ব কি দুনিয়ার শ্রমিকদের মুক্তি এনে দেবে, না দিতে পারে ? আজ অসহায় শ্রমিক পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিপর্যস্ত শ্রমিক শ্রেণির একটা বিশাল অংশ হয় বাবুদের ভাববাদী সংস্কৃতি, না হয় কল্পনাবিলাসী মনোভাব বা উগ্র বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, কিংবা গ্রামীণ কুসংস্কারের দ্বারা

আচ্ছন্ন। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তো মুক্তি সংগ্রাম করতে হয়। এই প্রসঙ্গেই লেনিন বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রের ভাবনা-ধারণা, সর্বহারা সংস্কৃতি ও তার ধ্যান-ধারণা বাইরে থেকে আসে (comes from without)। যার অর্থ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে আপনা-আপনি এটা গড়ে ওঠে না, বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনগুলি পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে এটা গড়ে ওঠে। এই অর্থে বাইরে থেকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব যে নেতৃত্বের উপর অর্পিত, সে তো আজ নিজেই অধঃপতিত। বিচারের ক্ষেত্রে কখনো সখনো সামান্য ভুল হওয়াটা অসম্ভব নয় — এ হতেই পারে। কিন্তু যে নেতৃত্ব নিজেই অধঃপতিত, সে শ্রমিকদের অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করবে কেমন করে? তাদের আন্দোলনের সঠিক পথ দেখাবে কেমন করে? কিন্তু আমাদের নিরাশ হলে চলবে না। বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে আশার আলোও আছে। যে শ্রমিকরা মুক্তি চান, তাঁরা লড়ছেন এবং এই সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও সমস্যার কিছু কিছু দিক তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, চিন্তাগত ক্ষেত্রে বিস্তৃত এই বিভ্রান্তিগুলি ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। অনেকদিন আগে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে এক ধরনের যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি চেপে বসেছিল। যে সব কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল না, তাদের কথা শোনার জন্য কেউ তৈরিই ছিল না। আজ অন্তত এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুক না মানুক, এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা তাদের বিচার-বিশ্লেষণ শুনছেন এবং বোঝার চেষ্টা করছেন।

এইরকম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এদেশের শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য কী? তাদের কর্তব্য কি লম্বা লম্বা বিপ্লবী বুক্‌নি শোনা? কীটপতঙ্গের মতো শুয়ে বসে জীবন কাটানো অথবা গোলামির মনোবৃত্তিকে লালন-পালন করে যাওয়া? এতো হচ্ছে সেই মনোভাব যে, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারাও এমন জীবন কাটিয়েছেন, আমরা কাটাচ্ছি, আমাদের ছেলে-নাতিরাও কাটাবে, কিছুই করার নেই। এই মনোবৃত্তি যদি দূর করা না যায়, তাহলে সত্যিসত্যিই কিছু হবে না। এতো হচ্ছে সেই ভাব যে, দুনিয়ায় কোথায় কী হচ্ছে ভেবে কি হবে ? কোথায় বিপ্লব হল, বিপ্লবের কী পরিস্থিতি, বিপ্লবী নেতৃত্বে কীভাবে বিচ্যুতি এল, কোন আদর্শগত (ideological) প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতভেদ ও ফাটল দেখা দিল — আমরা কেন এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব? আমরা শ্রমিক, আমাদের দাবি পূরণ হবে কি না, কিছু পাওয়া যাবে কি না, এসব বিষয়ে যদি কিছু বলার থাকে

তো শুনতে রাজি আছি — এই হল মনোভাব। এই মনোবৃত্তি যদি দূর করা না যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, আপনারা যাঁরা মেহনতি মজদুরদের নেতা তাঁরাও যদি এই মনোবৃত্তি নিয়ে চলেন, তাহলে আমি বলছি, আপনারা লিখে নিন — সত্যিসত্যিই কিছু হবে না। আপনারা যাঁরা প্রতিনিধি হয়ে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা কেউ নিজেরাই শ্রমিক, কেউ বা শ্রমিকদের নেতা — আপনাদের একথা বুঝতে হবে যে, আপনাদের সম্পর্ক শুধু নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গেই নয়, আপনাদের সম্পর্ক সারা পৃথিবীর সঙ্গে, সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে। আপনাদের আরও বুঝতে হবে, শুধু নিজের দেশের বিপ্লবের সফলতার জন্যই নয়, সারা বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনগুলি নিয়েও আপনাদের কিছু ভাবা দরকার, কিছু করা দরকার। আপনাদের ভাবা দরকার, কেন তা আমরা করতে পারছি না। এদেশের ৫০-৫২ কোটি শ্রমিক কম কিসে? আমরা কি অযোগ্য, না অক্ষম? না, তা নয়। আমরা অসংগঠিত, অসচেতন। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, বিশেষ করে বিপ্লবী চেতনা এখনও তেমন করে গড়ে ওঠেনি। এই কারণেই এখানকার শ্রমিক শ্রেণি এই দায়িত্ব ঠিকঠাক ভাবে পালন করতে সমর্থ হয়নি। ফলে এই ঘাটতি পূরণে আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে যেমন বিশ্বজোড়া সাংস্কৃতিক এবং নৈতিকতার সংকটের (crisis of culture and ethics) কালো ছায়া আজ এদেশেও পড়েছে, অপরদিকে এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনেও নানা বিভ্রান্তি চূড়ান্তভাবে ঘনীভূত হয়েছে (confusion worst confounded)। এই পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন আসতেই পারে যে, এমনটা হল কেন ? আপনারা জানেন, ভারতবর্ষের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত কমিউনিস্টরাই এদেশে প্রথম লালঝান্ডা উড়িয়েছিলেন। তাঁদের হাতে লালঝান্ডা অপমানিত হয়েছে, কলঙ্কিত হয়েছে — এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কথাটা ঠিক যে, তাঁরাই প্রথম লালঝান্ডা উড়িয়েছিলেন। যেহেতু তাঁরাই বিপ্লবের আওয়াজ তুলেছিলেন, তাই জনসাধারণ আশা করেছিল, তাঁরা আদর্শগত প্রশ্নগুলোকে পরিষ্কার করে বিপ্লবে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন। বিপ্লবের মূল চরিত্রকেও রক্ষা করার দায়িত্ব সেদিন তাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল। আর যেহেতু তাঁরা মার্কসবাদী এবং বিপ্লবী বলে দাবি করেন, তখন তো বলাবাহুল্য, বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদেরই ছিল। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। 'তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে', 'সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের ঐক্য ভেঙে

দিয়েছে', বা 'কংগ্রেস কথা রাখেনি' — নিজেদের আদর্শগত বিচ্যুতি আড়াল করার জন্য তাঁরা মাঝে মধ্যে এই সমস্ত কথা বলে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই সমস্ত অজুহাতের কোনও অর্থ আছে কি? এইসব কারণে কি তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন? সাম্রাজ্যবাদীরা, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা, কংগ্রেসিরা, তাদের যা করার ছিল ঠিক তাই তারা করেছে। জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে, বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে পুঁজিপতিদের সমূলে উচ্ছেদ করতে কি এরা সহায়তা করবে? তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের তো বিশ্বাসঘাতকতা করারই কথা, কংগ্রেসিদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিভেদ সৃষ্টি করাই তো কাজ। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের, কংগ্রেসিদের, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের ও তাদের দালালদের কৌশলকে ব্যর্থ করার, জনসাধারণকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে একতাবদ্ধ করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তো যাঁরা কমিউনিস্ট নাম নিয়ে কাজ করছিলেন, সেই তাঁদের উপরই ছিল। এখানে চিন্তা করার বিষয় হল, এই দায়িত্ব পালনে কেন তাঁরা অসমর্থ হলেন? তার কারণ কি শুধু এটাই যে, রাম আমাকে কাজ করতে দেয়নি, কিংবা শ্যাম আমাকে ভাঁওতা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে? দেখুন, কী বিচিত্র তাঁদের কথা! কী বিচিত্র তাঁদের পার্টির বিচার!

শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী এইসব তথাকথিত সমাজতন্ত্রী বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের এবং গান্ধীবাদীদের চরিত্র মার্কসবাদীদের কাছে পরিষ্কার। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাজই হল মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতার শক্তি (forces of compromise) হিসাবে ভূমিকা পালন করা। তাঁদের কাজ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী চিন্তা ও বিপ্লবী দলের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। এই কারণেই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির পথপ্রদর্শক মার্কস-লেনিন এদের সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে যখন তার আবির্ভাব ঘটে তখন এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসের শক্তি হিসাবে কাজ করে। তাই শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে যদি এদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না করা যায় তাহলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা অসম্ভব। স্ট্যালিন বলেছেন — "সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের নির্মূল করা ছাড়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।" (It is impossible to put an end to capitalism without putting an end to social democratism)। যদি আপনারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে চান তাহলে সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে এই তথাকথিত সমাজতন্ত্রী বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সরিয়ে

দিতে হবে। মেহনতি মানুষ ও তাদের আন্দোলনকে এদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। না হলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

ভারতবর্ষেও এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের কাজ সফলতার সঙ্গে করেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নামে যাঁরা চলছেন তাঁদের থেকে তো তারা অনেক বেশি চাতুর্যের সঙ্গে করেছে। আপনাদের আমি বলেছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাজই হল শ্রমিকদের বিপ্লবের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, গণআন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এসবই তারা করেছে। আপনারা জানেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রদায়ের নামে, জাতপাতের নামে, ধর্মের নামে এবং প্রাদেশিকতার নামে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। বলাবাহুল্য, চালাকির মাধ্যমেই তারা এই কাজটিকে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের নামে শপথ নেওয়া এই নামধারী কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেননি। আর তাঁরা এটা করবেনই বা কী করে? তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা যেমন দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, তেমনি তাঁরাও তো বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। তাঁরা যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট হতেন এবং তাঁদের পার্টি যদি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হত, তাহলে তাদের দ্বারা এটা করা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কখনও আপনাদের মনে এই কথা এসেছে কি যে, ওই নেতৃত্ব যাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অবিবেচক, যাঁরা বুদ্ধিহীনদের মতো ব্যবহার করেছে, তাঁরা আপনাদের উচ্ছন্নের পথে নিয়ে গেছে?

দ্বিতীয়ত, কখনও আপনারা ভেবেছেন কি যে, এই উথালপাথাল পরিস্থিতিতে আপনাদের দায়িত্ব কী ছিল, আপনাদের কর্তব্য কী ছিল? একবারও কি আপনাদের মনে এসেছে, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের এহেন কার্যকলাপের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ, ছিল নিজেদের ভবিষ্যৎকে গুছিয়ে নেওয়ার ধান্ধা? আপনারা জানেন, তাঁরা আজও বড় বড় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কেউ মন্ত্রী হয়েছেন, কেউ পার্লামেন্টে গিয়েছেন, বিধানসভায় গিয়েছেন, কেউ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োচ্ছেন, কেউ বিলেত যাচ্ছেন, কেউ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বাণী দিচ্ছেন, কাগজে তাঁদের ফটো ছাপা হচ্ছে এবং কারোর গলায় মালা চাপিয়ে আপনারা 'জিন্দাবাদ' করছেন। বিখ্যাত নেতা হয়ে সমাজের মাথার উপরে বসে তাঁরা তাঁদের রাজনীতির দ্বারা মানুষকে শোষণ করবার একটা রাস্তা পেয়ে গিয়েছেন। আর এটাই তো ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। শোষণ কি কেবল শিল্প (industry) আর

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই হয়, রাজনীতির মাধ্যমে হয় না? শোষণের অনেক পথ আছে। আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং কংগ্রেস-এর নেতারা কী করছেন ? তাঁরা কি রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ করছেন না?

সব সময়ে মনে রাখবেন, সাধারণভাবে আন্দোলন দু'টি ভিন্ন রাস্তায় আমাদের নিয়ে যেতে পারে। সঠিক পথে পরিচালিত হলে আন্দোলন আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারে, কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত হলে এ আমাদের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে। বিপ্লবের পথ বড়ই জটিল, এই পথে চলা সহজ নয়। এই পথে ভুল হোক তাতে অসুবিধা নেই। ভুল থেকে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা নিতে হবে, তাকে শুধরে নিতে হবে। কিন্তু ভুল হয়েছে বলে এবং বিপ্লবী পথের জটিলতা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সংগ্রাম ও আদর্শকে পরিত্যাগ করবেন না। আদর্শকে আরও সমৃদ্ধ করুন, বাস্তবসম্মত করুন যাতে তা কর্মোপযোগী হয়, সঠিক হয়, কাল্পনিক না হয়ে যায় — এটাই সব থেকে বড় কথা। শুধুমাত্র সংগ্রামই সব নয়। কেবলমাত্র লড়াই থেকেই চরিত্র গঠন হয় না। যদি শুধু লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চরিত্র তৈরি হত এবং তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, অতীতের যে সমস্ত সংগ্রামী নেতারা পরবর্তীকালে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা কি কম সংগ্রাম করেছিলেন? ভারতবর্ষে বহু সংগ্রাম হয়েছে, তা কি এই সমস্ত নেতাদের চরিত্রকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে? তথাকথিত কমিউনিস্ট, এইসব বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট কি বিপ্লবকে সঠিক দিশা দেখাতে পেরেছে? ভুলে যাবেন না, লড়তে লড়তেই এঁরা শোধনবাদী হয়েছেন, আত্মসর্বস্ব সুবিধাবাদী নেতায় (political careerists) পরিণত হয়েছেন। আন্দোলন প্রয়োজন, আন্দোলন ছাড়া বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি হয় না — একথা ঠিক। কিন্তু মূল কথা হল — আন্দোলন যদি সঠিক রাস্তায় পরিচালিত না হয়, সঠিক চিন্তার ভিত্তিতে না হয়, তাহলে সেই আন্দোলন আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাই বলছি, অন্ধের মতো শুধু 'লড়াই-লড়াই' বলে চিৎকার করলেই হবে না।

ট্রটস্কির নাম তো আপনারা শুনেছেন। রুশ দেশের বিপ্লবে তাঁর অবদান অস্বীকার করার মতো নয়। কিন্তু তিনি বিপথগামী হয়ে গেলেন কেমন করে? তিনি কি সংগ্রাম করেননি? প্লেখানভের কী হয়ে গেল? বুখারিনের পতন কেন হল? এঁদের নাম আমি এই কারণে করছি যে, আপনারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। বিপ্লবের স্লোগান আপনারা যতই দিন না কেন, আদর্শগত প্রশ্নগুলির সঠিক উপলব্ধি ব্যতিরেকে আপনারা এক পাও এগোতে পারবেন না। এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আদর্শকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করে

নিজেদের উপলব্ধিকে উন্নত করার দ্বারাই আপনারা নেতৃত্বকে সঠিক পথে ধরে রাখতে পারবেন, তাকে রক্ষা করতে পারবেন। যে নেতৃত্ব আপনাদের ভুল পথে চালিয়ে মাঝপথে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন, আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আজ তাঁদের আপনারা যতই গালিগালাজ করুন না কেন, সেই পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব কিন্তু কম ছিল না। এটাও তো ঠিক যে, সবদিক থেকে না ভেবে এদেশের শ্রমিকরাই তো অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন।

তাই আমি আরেকবার আপনাদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, কাউকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন না। এতে বিপ্লবের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এই ক্ষতি মূলত দু'ধরনের। এক, শ্রমিকদের সাথে নেতৃত্বের কোনও দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে না। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত না হলে নেতৃত্বের জ্ঞান ও চিন্তা করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে না। মনে রাখবেন, এই চিন্তা করার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত কিছু নয়। এ গড়ে তুলতে হয়, আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমেই তা গড়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত কীসের জন্য? উদ্দেশ্য ও মন যদি পরিষ্কার থাকে, নীতি ও পথ যদি সঠিক হয়, তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভয় কীসের? একথা ঠিক, দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্যা তাঁদের ক্ষেত্রেই হয় যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিষ্কার এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন প্রয়োজন তা জানেন না। কিন্তু সচেতন বিপ্লবী এটা বোঝে যে, জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। এই কারণেই এইসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় ক্ষতিকারক দিকটি হল, না বুঝেশুনে চোখ বুজে অন্ধের মত নেতার পিছনে ছুটলে শ্রমিক শ্রেণির চিন্তার বিকাশ ঘটবে না, তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম হবে এবং তাদের মনোবল ভেঙে যাবে। আমাদের দেশে ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছে। অতীতে আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, শ্রমিকরা মার খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হতাশা এসেছে এবং ব্যর্থতার জন্য তাঁরা নিজেদের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছেন। আজ যদি কোনও অসচেতন বা অসহায় শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেন, সে বলবে, কে কমিউনিস্ট, কে সোস্যালিস্ট তাতে আমাদের কী যায় আসে? ওদের কেউ নেতা-মন্ত্রী হবে, লোকসভায় যাবে, সরকার বানাবে — তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা তো শ্রমিক, শ্রমিকই থাকব। তাই এসব ঝুট-ঝামেলায় আমাদের দরকার কী? এই ধরনের উদাসীনতার মূল কারণ — হতাশা। এইসব চিন্তা আমাদের দূর করতে হবে। সাথে সাথে ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাও নিতে হবে যে, নেতৃত্বের পিছনে চোখ বুজে অন্ধের মতো চলার ফলে আজ

আমাদের কী হাল হয়েছে। ক্ষতি আমাদেরই হয়েছে — নেতাদের কী যায় আসে? এই কারণে শ্রমিক আন্দোলন চালাতে চালাতে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা স্বচ্ছ করতে হবে এবং আদর্শগত উপলব্ধি উন্নত করতে হবে। বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। শ্রমিক জনসাধারণকে অতি অবশ্যই আমাদের দেশের বিপ্লবের স্তর (phase of revolution) কী, তা সঠিকভাবে বুঝতে হবে। এর সাথে সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিপ্লবী শ্রমিক-কর্মচারী এবং যুবকদের বিস্তারিত জ্ঞান যদি নাও থাকে, তাহলেও অন্তত মোটামুটি একটা ধারণা অতি অবশ্যই তাঁদের গড়ে তুলতে হবে।

আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করতে চাই। আমরা যারা বিপ্লবী, তাদের কাছে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও লক্ষ্য বিবর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কোনও অর্থ নেই। কিন্তু এটাও সত্যি যে, শ্রমিক জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আসেন, তাঁরা অজ্ঞাতসারে হলেও এখনও গোলামির মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। আপনারা এটাও তো বুঝতে পারছেন, শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যদি এটাই অর্থ হয় যে, গোলামের মতো মালিকদের কাছ থেকে কিছু ভিক্ষা চাওয়া, তাহলে আমাদের বিপ্লবীদের এখানে প্রয়োজন থাকে না। অথচ আজ ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই একটা জরুরি লড়াই। এই লড়াই ছাড়া বেঁচে থাকাই মুশকিল। কিন্তু এই লড়াই তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যখন সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে আমরা পুঁজিবাদ ও শোষণের আসল চেহারাটা এবং বর্তমান রাষ্ট্রের সাথে শোষণের কী সম্পর্ক তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পারব, শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও চরিত্র গড়ে তুলতে পারব। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনায় যদি আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তাহলে সে আন্দোলন একেবারেই নিরর্থক।

কোনও কোনও আন্দোলনে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে শ্রমিক লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে যান। যদি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিষ্কার থাকে এবং আদর্শগত উপলব্ধি ত্রুটিমুক্ত হয়, তাহলে লড়াইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পেতে অসুবিধা হয় না। এই প্রক্রিয়ায় লড়াই গড়ে তুলতে হলে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে উপলব্ধি উন্নত হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে লড়লে দাবি-দাওয়ার লড়াইও আমরা সঠিক পদ্ধতিতে ও পথে চালাতে পারি। শ্রমিকদের শিক্ষিত করবার জন্য আমরা দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত আলোচনা দু'ভাবে রাখতে পারি। প্রথমটা হল, জুলুমের কায়দাটা কী, শোষণটা কী রকমের,

কোনখানে অন্যায়, আমাদের সমস্যা কী এবং এই প্রেক্ষিতে আমাদের দাবিগুলি কী কী, দাবিগুলি কতটা ন্যায্য ও আইনসম্মত, কতটাই বা বেআইনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রমিকদের সুপ্ত উৎসাহ জাগাবার জন্য উদ্দীপ্ত আলোচনা রাখা অতি অবশ্যই খুবই গুরুত্ব পাবে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয়টি হল, বাস্তবে এই লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা বোঝানো, অর্থাৎ এটা বোঝানো যে, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য আপনারা লড়াই যতই তীব্র করুন না কেন, কিছু দাবি যদি মিলেও যায় তাহলেও মুক্তির দরজা খুলবে না। আমরা যদি বিষয়টা এভাবে রাখি তখন শ্রমিকরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝবেন — লড়াইকে জোরদার করার জন্য তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, লড়াই জোরদারও হয়েছে, কিন্তু শোষণ থেকে তারা সত্যিকারের মুক্তি পাননি। এইভাবে অগ্রসর হলে আমরা শ্রমিকদের দেখাতে পারব, মুক্তির দরজা খুলতে হলে এইসব লড়াইয়ের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইও কেন অতি অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। এই কথাও বোঝানো যাবে যে, মুক্তির দরজা ততদিন পর্যন্ত খোলা যাবে না, যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগঠন, অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল করার অপরিহার্যতা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। শুধুমাত্র চিৎকার করলেই অর্থনীতিবাদ (economism) থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তার জন্য উপযুক্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিতে হবে। এটা একটা কঠিন দায়িত্ব। কতিপয় তথাকথিত বিপ্লবীদের বলতে শুনি, 'শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ছে, শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে আপনাআপনি বাড়ছে'। দলিল পেশ করে তাঁরা বলেন, 'পুলিশকে তো শ্রমিকরা জনসাধারণের সেবক বলে মনে করে না। তারা জেনে গেছে যে, পুলিশ হচ্ছে শোষকদের, বিত্তশালীদের শোষণের হাতিয়ার, তাদের দালাল। পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রতি জনসাধারণের মনে প্রবল ঘৃণা বর্তমান। তাদের দানধ্যান, ত্যাগের বুকনিকে জনসাধারণ বুঝে ফেলেছে। তারা জেনেছে যে, ওরা শ্রমিকদের শত্রু, শ্রমিকদের ঘাম থেকে ওরা লাভ তুলছে। হ্যাঁ, এইসব ব্যাপার আপনাদের মতো শ্রমিকরা অত ভাল করে দেখতে পারে না। কিন্তু শ্রমিকরা সব বোঝে।' এইসব কথা শুনে বড় দুঃখ হয়। আমি জানি, এইসব বক্তব্য যে সব রাজনৈতিক কর্মীরা রাখেন, যাঁরা রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের ঠিকা (contract) নিয়েছেন, তাঁরা যখন জনসভাগুলোতে চিৎকার করে বলেন— 'এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোকে যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা উচ্ছেদ না করে ফেলবে, ততদিন শ্রমিকরা মুক্তি পাবে না।' এইসব শুনে

শ্রমিকরা হাততালি দেয়, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানও দেয়। আবার সেই শ্রমিকরাই সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করে, 'আমাদের দাবিগুলোর কী হল, আমরা তা কখন পাব, এগুলো কেন পাইয়ে দিচ্ছেন না?' আবার আন্দোলনের ব্যাপারে কোন কাজের দায়িত্ব দিলে এই শ্রমিকদেরই বলতে শোনা যায় —'আমি এটা কী করে করব, আমি তো নিরুপায়, আমার স্ত্রী আছে, কাচ্চাবাচ্চা আছে।' এর থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন, শ্রমিকদের এই তথাকথিত চেতনা কেমনতর রাজনৈতিক চেতনা? রাজনৈতিক চেতনার অর্থ হচ্ছে, বিপ্লব সম্পর্কে চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আদর্শগত প্রশ্নে নিজেদের ধারণা পরিষ্কার করে তা শ্রমিকদের কাছে রাখতে হবে। আর একটার পর একটা আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনাকে জাগিয়ে বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন চর্চা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনা বাড়াতে হবে। এইভাবেই তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং তার বিকাশ সম্ভবপর হয়ে উঠবে। প্রথম প্রথম এই রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তুলতে খুবই অসুবিধা হবে। শ্রমিকেরা এইসব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বুঝবেন না। তাই ধৈর্য রাখতে হবে এবং ক্রমাগত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। যেসব তকমা-আঁটা বিপ্লবী বলেন যে, রাজনৈতিক চেতনা শ্রমিকদের মধ্যে আপন নিয়মেই ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁরা হয়ত নিজেরাই বোঝেন না — রাজনৈতিক চেতনার অর্থ কী। তাঁরা যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন, তাঁদের দ্বারা রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের কাজ অসম্ভব। যাঁরা নিজেরা বিপ্লবের জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন এবং বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেরা আটকে আছেন, তাঁরা কি এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন? আপনাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, শ্রমিকদের বোঝাতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আপনাদের পক্ষে এই মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। এটা অনেক ত্যাগ ও নিষ্ঠার (sacrifice, dedication and devotion) কাজ। যেসব নেতারা বিপ্লবের কথা বলতে বলতে অফিসে গেলেন, পঁচিশ কি পঞ্চাশটা ফাইলে সই করলেন, ট্রাইব্যুনালে অংশগ্রহণ করলেন, সভা ও সম্মেলনগুলিতে গরম গরম বুকনি দিয়ে ইনকিলাব বলে চিৎকার করলেন — সেইসব ঢিলেঢালা লোকেদের দ্বারা কি এই কাজ হতে পারে?

আর একটা বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে কখন কীভাবে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, এর হিসাব

করাটাই যথেষ্ট নয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সমস্যাগুলির মূল কোথায় এবং এর কারণ কী তার সন্ধান পাওয়া। কেন শ্রমিক আন্দোলনের একতা ভেঙে গেল, কেনই বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানে কোনও ফল হল না — এসব বিষয়ে তলিয়ে বুঝতে হবে। আমি শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের বলব, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করবেন না যে, আপনি এর কারণ ধরে ফেলতে পেরেছেন এবং এর সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা হয়েছে। কারণটা যদি সঠিকভাবে জানতেই পারতেন, তাহলে তো ফল পাওয়া উচিত ছিল। ফল কি পেয়েছেন? হয় এর কারণ খুঁজতে কোন খানে ভুল হয়েছে, নয়তো এও হতে পারে, আমাদের ভেতরে শক্তি ও ক্ষমতার অভাবের জন্য কারণ জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পাইনি। বিষয়টা এইরকম বলেই আমি মনে করি।

একই সঙ্গে আরও দু'একটি বিষয়ে আপনাদের আমি কিছু কথা বলতে চাই। বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনে নানাবিধ সমস্যা এসেছে। সংস্কারবাদ (reformism), শোধনবাদ (revisionism), অর্থনীতিবাদ (economism), হঠকারিতা (adventurism), মালিকের সাহায্য নিয়ে জোর করে অপরের ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া, বাইরে থেকে গুন্ডা এনে অপর ইউনিয়নের সদস্যদের ভয় দেখানো, পুলিশের সাহায্য নিয়ে লড়াকু ইউনিয়নের উপর আক্রমণ করা, শ্রমিকদের সাথে বেইমানি করা — এই সমস্ত সমস্যা বর্তমানে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বর্তমান। কিছু লোক এরকমও আছেন, যাঁরা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে অন্যদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করছেন। এরকম লোকেরা নিজেদের বাহাদুর মনে করেন। কিন্তু সরকারি ছত্রছায়ায় থেকে লড়বার ভনিতা করা তো ভীতুদের কাজ। এইরকম লড়াই লড়াই খেলায় তো বিপ্লবের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে যায় এবং শ্রমিকদের চিন্তাশক্তির মৃত্যু ঘটে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারে সামিল হওয়ার শর্ত হিসাবে আমরা বলেছিলাম — 'জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' — এই কথা সরকারকে ঘোষণা করতে হবে। এর দ্বারা আমরা এটা বলতে চাইনি যে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটা একটা কৌশল। একাজ বিপ্লবী দল কখনও করতে পারে না। এতো ক্ষমতাসীন সংসদীয় দলগুলোর কৌশল, যারা কখনও বিপ্লব চায় না বরং বিপ্লবের নামে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী শক্তি ও তাদের লড়াকু মনোভাবকে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু আপনারা লক্ষ করবেন, বর্তমানে আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে এ সবই করা হচ্ছে। আমরা বামপন্থীরা যদি ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনকে উন্নত স্তরে উন্নীত করতে চাই, তাহলে আমরা ন্যূনতম স্বীকৃত কর্মসূচির ভিত্তিতে (common minimum agreed programme) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না কেন ? যদি বাস্তবিকই শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, সেই কারণগুলোকে সঠিকভাবে খুঁজে বের করা, যেগুলির জন্য এইসব ঘটনা ঘটছে।

কিছু লোক আছেন, যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনে এই ধরনের দুর্বলতার জন্য রাজনীতিকে দায়ী করেন। এটা ভ্রান্ত ধারণা। আমি বুঝতে পারি না, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে এই ধরনের আন্দোলন কীভাবে চলবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাজনীতির বাইরে কি থাকা সম্ভব? অনেকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার কথা বলবেন। কিন্তু এটা অসম্ভব, এই ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আমার মতে, রাজনীতি নয়, ভুল রাজনীতি, যাকে সংকীর্ণতাবাদ (sectarianism) বলা হয়, তাকে কেন্দ্র করে এই ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। বিপ্লবীদের এবং সর্বহারা বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল, শ্রমিক ঐক্য বজায় রাখা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শ্রমিকদের আন্দোলন ও লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শ্রমিক সংগঠন মজবুত করার জন্য সংগ্রামের জটিল রূপ, যাকে আমরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বলি, তাকে বাস্তবায়িত করা এবং একই সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরন্তর অনুশীলন করা। যদি রাজনৈতিক আচারব্যবহারে আমরা এ সবের বিরোধিতা করি, তবে তো আমরা নিজেরাই সঠিক রাজনীতি বিরোধী কাজ করার দায়েই অভিযুক্ত হব। এ কথা তো ঠিক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এযাবৎকাল সঠিক রাজনীতি বিরোধী কাজই হয়ে এসেছে। সুতরাং কী করে তাকে সঠিক রাজনীতির চর্চা বলা হবে? পরিষ্কার বুঝতে হবে, যে রাজনীতি ট্রেড ইউনিয়ন অন্দোলনগুলির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তা কখনই বিপ্লবী রাজনীতি ছিল না — সেটা ছিল মেকি রাজনীতি (pseudo politics)। বিপ্লবী রাজনীতি কখনও ঐক্য ভাঙে না, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবীরা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে চলে যায় না। বিপ্লবীরা নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে মতভেদ হলে কারোর সাথেই আপস করে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এটাও জানে, আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে চালাতেই মজুর আন্দোলনে ঐক্য রক্ষার দায়িত্বও তাদের উপরই। সংগ্রাম ও ঐক্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জটিল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি একমাত্র বিপ্লবী দলেরই আছে। সেই বিপ্লবী দলকেই আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। এটা একান্ত আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্ন নয়, বরং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রশ্ন। আজ সত্যিকারের ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলনের দাবি — সঠিক রাজনীতি খুঁজে বের করুন এবং যত্ন সহকারে তা আয়ত্ত করুন, যাতে একদিকে সমস্ত রকম বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে পারেন, সংশোধনবাদী প্রভাব থেকে নিজেরা সর্বদা মুক্ত থাকতে পারেন, বিপ্লবের মুখোশপরা দালালদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারেন, আর অন্যদিকে শ্রমিক ঐক্য সুদৃঢ় করতে পারেন, নিজেদের সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং সংগ্রামকে তীব্রতর করতে পারেন। এই দুটো লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসহায়তার মনোভাব ঝেড়ে ফেলে আপনাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে প্রয়াস চালাতে হবে।

আজ এদেশের শ্রমিকেরা মুক্তি চায়, কিন্তু এই মুক্তি তাদের বাইরের কেউ এনে দেবে না। মালিকরা তাদের যে স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছে, তাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। শ্রমিকরা যদি এক নয়া দুনিয়া তৈরি করতে চান, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান, তবে তার জন্য শ্রমিকদের নিজেদেরই কোরবানি দিতে হবে। বাবুরা কোরবানি দেবেন আর শ্রমিকরা মুক্তি পেয়ে যাবেন, এমনটা ঘটবে না। এই ধরনের ঘটনা বিশ্ব সংসারে কখনও হয়নি, হতে পারে না — এই কথাটা মনে রাখবেন।

আর এই কথাটাও অতি অবশ্যই মনে রাখবেন যে, পুঁজিবাদ নানা ফন্দি এঁটে আপনাদের শৃঙ্খলিত করে রাখতে চায়, আপনাদের অসহায় করেই রাখতে চায়। পুঁজিবাদের এই কৌশলকে পরাস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের তার থেকে মুক্ত করা, নিজের ভিতরের ভয় এবং অসহায়তাকে খতম করার জন্য নিজের ভিতরেই লড়াই চালানো, নিজেকে লড়াকু বানানো, বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করা এবং আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সর্বদাই লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকা — এই রাস্তা ধরে যদি প্রতিটি শ্রমিক ও যুবক এগিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে ভারতের বর্তমান অবস্থা বদলে যাবে। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ !

১৯৬৯ সালের ৩০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঝরিয়ায়
অনুষ্ঠিত এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয়
সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে ভাষণ।